শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩৩. নিশ্চয়ই কুরআন আল্লাহর কালাম, যা আল্লাহর নিকট থেকে কথা হিসেবে শুরু হয়েছে, তবে এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না। ......

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

আল্লাহর কালামের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মাযহাব এবং বিরোধীদের জবাব - ২

আল্লাহর কালামের ব্যাপারে কথা হলো, এর মাঝে এবং মুসহাফের মাঝে কোনো যোগসূত্র ও সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ হুবহু আল্লাহর কালাম মুসহাফে লিখা হয়েছে। কালাম অন্যান্য অস্তিত্বশীল বস্তুর মত নয়, যা প্রথমত জানা যায় বা নির্দিষ্ট একটি স্থান দখল করে অস্তিত্বশীল হয়েছে। অতঃপর জবানের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়, অতঃপর তা কাগজে লিখা হয়। এক কথায় মুসহাফের কাগজে কালি দিয়ে হুবহু আল্লাহর কালাম লিখা হয়েছে। এটি এমন কোনো বস্তুর মত নয়, যার নাম কাগজে লিখা হয়, কিন্তু তার অস্তিত্ব থাকে অন্য স্থানে। মোট কথা কাগজ, কলম কালি এবং জবান সৃষ্টি হলেও কাগজ ও কালির মাধ্যমে লিখিত কালাম এবং জবানের মাধ্যমে পঠিত কালাম তার সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন থাকা এবং সুক্ষ্ম চামড়া বা কাগজের উপর লিখিত থাকা অথবা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত থাকা কিংবা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

‘‘আর আগের লোকদের কিতাবেও এ কথা আছে’’। (সূরা শুআরা: ১৯৬)

অর্থাৎ কুরআনে যে উপদেশ রয়েছে, তার আলোচনা, গুণাগুণ এবং সংবাদ পূর্বের কিতাবসমূহেও ছিল। এমনটি নয় যে, কুরআন হুবহু পূর্বেও নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতির লোকদের কিতাবসমূহে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম লিখা ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা কেবল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরই কুরআন নাযিল করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কারো উপর এটি নাযিল করা হয়নি। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা في الزبر (লিখিত গ্রন্থসমূহে) বলেছেন; في الصحف (পুস্তিকায়) বলেননি এবং في الرق বলেননি। কেননা الزبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। الزَّبْرِ শব্দের অর্থ হলো লিপিবদ্ধ করা ও একত্র করা। আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

‘‘আর আগের লোকদের কিতাবেও এ কথা লিখা আছে’’ (সূরা শুআরা: ১৯৬) । অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহেও কুরআনের খবর ও গুণাগুণ লিপিবদ্ধ রয়েছে; হুবহু এ কুরআনটি লিখা নেই। الزبر শব্দ এবং তা থেকে নির্গত শব্দের মধ্যেই এমন অর্থ রয়েছে, যা উদ্দিষ্ট অর্থকে সুস্পষ্ট করে দেয়। সে সঙ্গে আরো বর্ণনা করে দেয় যে, কুরআনের বর্ণনা খুবই পরিপূর্ণ এবং সন্দেহ ও অস্পষ্টতা মুক্ত। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও কুরআনের আলোচনা রয়েছে, এ কথাটির অনুরূপ হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ

‘‘যার উল্লেখ তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত অবস্থায় পায়’’। (সূরা আরাফ: ১৫৬) অর্থাৎ তার আলোচনা পায়। এটি আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ‘‘পাতলা চামড়ার উপর উহা লিখিত আছে’’। (সূরা তূর: ৩), আল্লাহর বাণী:

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ‘‘উহা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে’’। (সূরা বুরুজ: ২২) এবং আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ‘‘এটি একটি সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে’’। (সূরা ওয়াকিয়া: ৭৮) এর বিপরীত। কেননা উপরোক্ত আয়াতগুলোতে যে হরফে জার্ في রয়েছে, তাতে যে عامل এর প্রয়োজন, তা কখনো সাধারণ فعل (ক্রিয়া) হয়। যেমন كون, استقرار, حصول ইত্যাদি। অথবা উহ্য শিবহে ফেল, مكتوب শব্দটি নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ উহ্য রূপটি এমন হতে পারে, مكتوب في رق منشور, مكتوب في كتاب مكنون, مكتوب في لوح محفوظ

كتاب শব্দটি ব্যবহার করে কখনো এর দ্বারা লিখার স্থান উদ্দেশ্য করা হয়। আবার কখনো লিখিত কালামও উদ্দেশ্য হয়। কিতাবের মধ্যে কালাম লিখা এবং কিতাবের বাইরে অস্তিত্বশীল জিনিসগুলো কিতাবের মধ্যে লিখার মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। কিতাবের বাইরে অস্তিত্বশীল জিনিসগুলো কিতাবে লিখার সময় কেবল তার আলোচনাই লিখা হয়। আর কালাম লিখলে হুবহু তাই লিখা হয় এবং তা যার কালাম তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। মানুষ যতই এ অর্থটি নিয়ে চিন্তা করবে, ততই তার জন্য পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার সত্তা থেকে যে কালাম বের হয়, তার প্রকৃত অবস্থা হলো, তা কখনো তার থেকে সরাসরি শুনা যায়, যেমন শুনেছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম অথবা আল্লাহ তা‘আলার বাণী প্রচারকারী থেকে শুনা যায়। শ্রবণকারী যখন তা শুনে, তখন তিনি তা জেনে নেন এবং সংরক্ষণ করেন। সুতরাং আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা যায়, সংরক্ষণ করা যায়। শ্রোতাগণ যখন তা পাঠ করে, তখন তারই পাঠ ও তেলাওয়াত হয়। যখন সে তা লিখে তখন তারই লিখা ও অঙ্কন বলে গণ্য করা হয়। এসব ক্ষেত্রেই উহা প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হবে। এটিকে নাকোচ করা অবৈধ। কিন্তু কোনো রূপকার্থকে নাকোচ করা বৈধ। সুতরাং এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, মুসহাফের মধ্যে যা আছে, তা আল্লাহর কালাম নয় এবং কারীগণ যা পাঠ করে, তাও আল্লাহর কালাম নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আল্লাহ তা‘আলা সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

‘‘আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় দাও’’।

এখানে আল্লাহ তা‘আলার কালাম শুনার জন্য যাকে আশ্রয় দেয়ার কথা বলা হয়েছে, সে কখনোই সরাসরি আল্লাহ তা‘আলা থেকে কালাম শুনবে না। বরং সে আল্লাহর বাণী প্রচারকারী থেকেই তা শুনবে। যারা বলে শ্রন্নত কালাম আল্লাহর সরাসরি কালাম নয়; বরং তা আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা, উক্ত আয়াত তাদের কথার প্রতিবাদ করছে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ‘‘যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়’’। এমনটি বলা হয়নি, যাতে সে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা শুনতে পায়। ভাষার ক্ষেত্রে আসল হলো এতে শব্দগুলো প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে, মুসহাফসমূহে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা আল্লাহর কালামের বর্ণনা রয়েছে; তাতে

আল্লাহর কালাম নেই, সে আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং উম্মতের সালাফদের ইজমার বিরোধিতা করবে। তার গোমরাহীর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

যারা বলে আল্লাহর কালাম মাত্র একটিই, আল্লাহর পক্ষ হতে তা শ্রবণ করার কল্পনাই করা যাবে না এবং নাযিলকৃত, শ্রূত, পঠিত ও লিখিত কালাম আল্লাহর কালাম নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার কালামের ব্যাখ্যা মাত্র, ইমাম ত্বহাবীর বক্তব্য তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা তিনি বলেছেন, مِنْهُ بَدَا وَإِلَيْهِ يَعُودُ "আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই এর সূচনা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকেই এটি ফিরে যাবে"।

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ ছাড়াও অন্যান্য সালাফগণ একই কথা বলেছেন। তারা আরো বলেছেন, আল্লাহর নিকট থেকেই এটি এসেছে এবং তার নিকটই ফিরে যাবে। ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ এ জন্য منه بدا বলেছেন, আল্লাহর সিফাতকে বাতিলকারী মুতাযেলারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো একটি মহলে বা স্থানে কালাম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই মহল থেকে কালাম বের হয়েছে। এ জন্যই সালাফগণ তাদের প্রতিবাদে বলেছেন, منه بدا অর্থাৎ তিনিই এর মাধ্যমে কথা বলেছেন। সুতরাং তার নিকট থেকে উহা এসেছে; কোনো কোনো সৃষ্টির পক্ষ হতে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

"এ কিতাব মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত" (সূরা যুমার: ১)। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জাহান্নাম জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেবো"। (সূরা সাজদাহ: ১৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ

"এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুছ ঠিক ঠিকভাবে তোমার রবের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছে"। (সূরা আল নাহাল: ১০২)

আলেমদের কথা, إليه يعود "তার দিকেই কালাম ফিরে যাবে", এর অর্থ হলো মানুষের বক্ষসমূহ থেকে এবং মুসহাফসমূহ থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর মানুষের অন্তরে কিংবা মুসহাফে কোনো আয়াতই অবশিষ্ট থাকবে না। অনেক হাদীছে এ কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ত্বহাবীর উক্তি: بلا كيفية "এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না"।[12] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে কিভাবে কথা বলেছেন, তার ধরণ আমরা জানি না। আল্লাহ কথা বলেছেন, -এ কথা রূপকার্থেও বলা হয়নি। তিনি অহী আকারে এটি তার রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। অর্থাৎ ফেরেশতার মাধ্যমে তার রাসূলের নিকট তা পাঠিয়েছেন। জিবরীল ফেরেশতা তা আল্লাহর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনেছেন জিবরীল ফেরেশতার নিকট থেকে। অতঃপর তিনি মানুষের জন্য তা পাঠ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا

‘‘আর এ কুরআনকে আমি অল্প অল্প করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি থেমে থেমে তা লোকদেরকে শুনিয়ে দাও এবং এটি আমি যথাযথভাবেই নাযিল করেছি’’। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১০৬) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

‘‘এটি রববুল আলামীনের নাযিল করা কিতাব। একে নিয়ে আমানতদার রূহ অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। পরিষ্কার আরবী ভাষায়’’। (সূরা শুআরা: ১৯২-১৯৫)

এ আয়াতগুলো থেকে আল্লাহ তা‘আলার জন্য উলু তথা সৃষ্টির উপরে সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত হয়।[13] এ কথার উপর কেউ আপত্তি করে বলতে পারে যে, উপর থেকে কুরআন নাযিল হওয়া, বৃষ্টি নাযিল হওয়া, লোহা নাযিল করা এবং চতুষ্পদ জন্তুর আটজোড়া নর-মাদি নাযিল করার মতই।[14]

কেননা আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের অনেক স্থানেই বলেছেন যে, তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি নাযিল করেন, সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে তিনি বলেছেন,

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ

‘‘আমি লোহা নাযিল করেছি এবং সূরা যুমারের ১০৬ নং আয়াতে বলেছেন,

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ

‘‘তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু থেকে আটজোড়া নাযিল করেছেন’’। সুতরাং উপর থেকে কুরআন নাযিল হওয়ার অর্থ এ নয় যে আল্লাহ তা‘আলা উপরে এবং কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে।

উপরোক্ত আপত্তির জবাব হলো, কুরআন নাযিলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। আর উপরোক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তা বলা হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা সূরা মুমিনের ২ নং আয়াতে বলেন,

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

‘‘এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত যিনি মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞাত’’। আল্লাহ তা‘আলা সূরা যুমারের ১ নং আয়াতে বলেন,

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

‘‘এ কিতাব মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে’’। সূরা ফুস্সিলাতের ২ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

‘‘এটা পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে’’। সূরা হামীম সাজদার ৪২ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

‘‘কোনো বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, অগ্র হতেও না, পশ্চাত হতেও না। এটা প্রজ্ঞাবান ও পরম প্রশংসিত আল্লাহর নিকট থেকে হয়েছে’’। আল্লাহ তা‘আলা সূরা দুখানের ৩-৫ নং আয়াতে বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

‘‘আমি এটি এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি। আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় ফায়ছালা করা হয়। আমার নির্দেশক্রমে, আমি তো রসূল প্রেরণকারী’’। আল্লাহ তা‘আলা সূরা কাসাসের ৪৯ নং আয়াতে বলেন,

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

‘‘হে নাবী! তাদেরকে বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আনো আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি যা এ দু’টির চেয়ে বেশী হেদায়াতদানকারী; আমি তারই অনুসরণ করবো’’। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

‘‘আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা জানে এ কিতাবটি তোমার রবেরই পক্ষ থেকে সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তরভুক্ত হয়োনা’’। (সূরা আনআম: ১১৪) আল্লাহ তা‘আলা সূরা নাহালের ১০২ নং আয়াতে আরো বলেন,

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ

‘‘এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুছ সত্যসহকারে তোমার রবের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছে’’। আর বৃষ্টি নাযিলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, তা আসমান থেকে নাযিল হয়। আল্লাহ তা‘আলা সূরা ফুরকানের ৪৮ নং আয়াতে বলেন,

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

‘‘আমি আসমান থেকে নাযিল করি পবিত্র পানি’’।

এখানে আসমান থেকে নাযিল করার অর্থ হলো উপর থেকে নাযিল করা। অন্য স্থানে বলা হয়েছে যে, বৃষ্টি নাযিল হয় মেঘ থেকে।

সূরা নাবার ১৪ নং আয়াতেও মেঘমালা থেকে বৃষ্টি নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর লোহা ও চতুষ্পদ জন্তু নাযিল হওয়ার বিষয়টি কোনো কিছুর দিকে সম্বন্ধ না করেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কুরআন নাযিল হওয়াকে কিভাবে সৃষ্ট বস্তু নাযিল হওয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে? লোহা সাধারণত পাহাড়ের খনি থেকে বের হয়। আর পাহাড় সমতল ভূমি থেকে উঁচু থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, লোহার খনি যতই উঁচু স্থানে হয়, সেখান থেকে উৎপাদিত লোহার মানও ভাল হয়।

সুতরাং লোহা যেহেতু উপর থেকে পাওয়া যায়, তাই লোহার ক্ষেত্রে নাযিল কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর চতুষ্পদ জন্তু বংশানুক্রমে সৃষ্টি করা হয়। এতে নরপশুর পৃষ্ঠদেশ থেকে নির্গত পানি মাদিপশুর গর্ভাশয়ে অবতরণ করা আবশ্যক। এ জন্যই এ ক্ষেত্রে أَنْزَل বলা হয়েছে نَزَّل বলা হয়নি। কেননা উভয় শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। إنزال অর্থ হলো একসাথে নাযিল করা। تنزيل অর্থ হলো ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে অবতীর্ণ করা।

এখানে আরেকটি ধর্তব্য বিষয় হলো, নবজাতক শিশু বা পশুর বাচ্চারা তাদের মায়ের পেট থেকে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে। আরেকটি জানা কথা হলো চতুষ্পদ জন্তুর ষাঁড়গুলো প্রজনন কর্ম সম্পাদন করার সময় মাদিপশুর উপর উঠে। এ সময় পাঠা বা ষাঁড়ের পানি উপর থেকেই মাদির গর্ভাশয়ে অবতীর্ণ হয়। এমনি সে যখন বাচ্চা প্রসব

করে, তখন উপর থেকে নীচের দিকেই বাচ্চাকে নিক্ষেপ করে। এর উপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে,

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ

‘‘তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু থেকে আটজোড়া নাযিল করেছেন’’ (সূরা যুমার: ৬)। এখানে من হারফে জার্ দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(১) جنس الأنعام তথা সকল প্রকার চতুষ্পদ জন্তু বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা

(২) সূচনার সীমা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

‘‘যিনি তোমাদের আপন প্রজাতি থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ অন্যান্য জীব জন্তুর প্রজাতি থেকেও তাদের জোড়া বানিয়েছেন’’ (সূরা শুরা:১১), এখানেও মিন্ হারফ জার্টি উপরোক্ত দু’টি অর্থই প্রদান করার সম্ভাবনা রাখে।

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا‘‘আর ঈমানদারগণ তাকে এ ব্যাপারে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছেন’’। আল্লাহ তা‘আলা প্রকৃতপক্ষেই কথা বলেছেন এবং কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেছেন। এটিই ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারী তাবেঈদের উক্তি। তারাই হলেন সালাফে সালেহীন। আর এ কথাই সত্য ও সঠিক। ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ

তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষেই কুরআন আল্লাহর কালাম, কোনো সৃষ্টির কথার মত সৃষ্টি নয়। এখানে শাইখ সুস্পষ্টভাবেই মুতাযেলা এবং অন্যদের প্রতিবাদ করেছেন। ‘প্রকৃতপক্ষেই কুরআন আল্লাহর কালাম’ এ কথার মাধ্যমে শাইখ ঐসব লোকের প্রতিবাদ করেছেন, যারা বলে আল্লাহর কালাম মাত্র একটি, তা তার সত্তার সাথেই প্রতিষ্ঠিত এবং তা শুনা যায় না। তা কেবল কালামে নাফসানী বা আত্মিক কালাম। কেননা যার নফসের সাথে কালাম প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু সে তার মাধ্যমে কথা বলেনি, তার নফসের সাথে যুক্ত কালামকে প্রকৃত কালাম বলা হয় না। তার কথাকে কালাম বলা হলে বোবাকে মুতাকাল্লিম বলা যথার্থ হবে।[15]

কেননা তার নফসের সাথেও কালাম যুক্ত আছে। যেহেতু বোবাকে মুতাকাল্লিম বলা ঠিক নয়, সে হিসাবে মুসহাফের মধ্যে বিদ্যমান কালামকে কুরআন বলা কিংবা আল্লাহর কালাম বলা ঠিক হবে না। কিন্তু বলা হবে যে, তা আল্লাহর কালামের অর্থ মাত্র; তা হুবহু আল্লাহর কালাম নয়। যেমন বোবা কারো প্রতি ইশারা করলো। ইশারার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে সে লোকটি উহা লিখে নিল, যার প্রতি সে ইঙ্গিত করেছে। এ ব্যক্তি যা লিখেছে তা ঐ অর্থের নাম মাত্র। আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর কালামের ব্যাপারে যা বলে, তার জন্য এ দৃষ্টান্ত হুবহু প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলাকে তাদের কেউ বোবা হিসাবে নামকরণ করে না। তবে তারা বলে জিবরীল ফেরেশতা আল্লাহর নফসের সাথে যুক্ত কালামকে বুঝে নিয়েছে। তিনি আল্লাহ তা‘আলা থেকে একটি অক্ষর বা একটি আওয়াজও শুনেনি। বরং তিনি শুধু অর্থকেই বুঝেছেন। অতঃপর তিনি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং জিবরীল ফেরেশতাই নিজস্ব ভাষায় কুরআনের শব্দমালা ও আরবী গ্রন্থনা তৈরী করেছেন। অথবা আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কোনো জিসিম যেমন বাতাস বা অন্য কিছুর মধ্যে এ কালামের অর্থটি সৃষ্টি করেছেন।

ফুটনোট

[12]. উল্লেখ্য যে, আল্লাহর কথা বলার কোনো ধরণ নেই এটা বলা হয়নি, বরং কোনো ধরণ জানা নেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কথা বলার ধরণ আমাদের জানা না থাকলেও উহার একটা ধরণ তো অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সে ধরণ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জানেন।

[13]. কেননা নাযিল সাধারণত উপর থেকে নীচের দিকেই হয়ে থাকে।

[14]. মুতাযেলারা বলে থাকে, বৃষ্টি নাযিল করা, লোহা নাযিল করা, চতুষ্পদ জন্তু নাযিল করার অর্থ যেমন সৃষ্টি করা, ঠিক তেমনি কুরআন নাযিল করা মানে তা সৃষ্টি করা। এটি নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের পক্ষ হতে কুরআন নাযিল করেছেন।

[15]. এটি আশায়েরা এবং অন্যদের যুক্তি।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8922

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন